শ্রদ্ধাঞ্জলি

সার্ধশতবর্ষে ফিরে দেখা : বিরসা মুণ্ডা

ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়

অধ্যাপক, জীববিদ্যা বিভাগ, পরিমল মিত্র স্মৃতি মহাবিদ্যালয়, জলপাইগুড়ি

সাল ১৮৯৫। তারিখ ২৪ আগস্ট। সাঁওতাল পরগণার অরণ্যে ঘেরা গ্রাম চালকাদে হাজির রাঁচি থানার ডেপুটি সুপারিনটেন্ডেন্ট দোর্দণ্ডপ্রতাপ মিয়ার্স। সঙ্গে বিশজন সশস্ত্র পাঠান কনস্টেবল। উদ্দেশ্য কুড়ি বছরের এক আদিবাসী তরুণকে বন্দি করা। পাঁচ ফুট চার ইঞ্চি উচ্চতার ছিপছিপে চেহারা, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, চঞ্চল চোখের সদাহাস্যময় সেই তরুণকে সেদিন ব্রিটিশ পুলিশ হাতকড়া পরিয়ে নিয়ে যায়। সমবেত উৎকণ্ঠিত আদিবাসী জনতার উদ্দেশে সে বলে যায়, ''আমি ফিরে আসব, তোমরা ভেঙে পোড়ো না।'' ব্রিটিশ সরকার ও তার মদতপুষ্ট জমিদার গোষ্ঠীর শোষণ এবং পাদরিদের ধর্মান্তরীকরণের বিপুল চেষ্টার ভিত নাড়িয়ে দিয়েছিল সেই যুবা। সে বিরসা মুণ্ডা।

বিরসার জন্ম ১৮৭৫ সালের ১৫ নভেম্বর ছোটনাগপুর অঞ্চলের (অধুনা ঝাড়খণ্ড) 'খুন্তি' জেলার উলিহাতু গ্রামে। বাবার নাম সুগানা, মা কারমি হাটু। বিরসা তাঁদের চতুর্থ সন্তান। ছোটবেলা থেকেই মিশুকে, বুদ্ধিদীপ্ত, শিল্পানুরাগী। লেখাপড়া আর ধর্মগ্রন্থ পাঠে গভীর আগ্রহ। বাঁশি বাজাতে দক্ষ। পড়াশোনা সালগা গ্রামের জয়পাল নাগের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে, বুরজু গ্রামের জার্মান মিশনারি স্কুলে, তারপর (১৮৮৬—১৮৯০) আপার প্রাইমারির পাঠ চাঁইবাসার জার্মান মিশনারি স্কুলে। একদিন প্রার্থনাসভায় পাদরি বলে ওঠেন, ''মুণ্ডা সর্দাররা সবাই ঠগ, জোচ্চোর।'' প্রতিবাদে গর্জে ওঠে বিরসা : ''না, তারা ঠগ নয়।... মুণ্ডা, ওরাওঁ, কোল জাতি জোচ্চুরি জানে না। ঠগ তারাই যারা মুণ্ডা সর্দারদের এতকাল ঠকাচ্ছে।'' বিরসা স্কুল ছেড়ে দেয়। বলে আসে, ''মিশনের সাহেব, অফিসার, পাদরি—সবাই একজাতের।''

বিরসা ফিরে আসে গ্রামে। দেহ শক্তিতে পূর্ণ, বুদ্ধি তীক্ষ্ণ, হৃদয় মমতাময়। সে দেখে মুণ্ডাজাতির মধ্যে রয়েছে বহু কুসংস্কার। একদিকে ব্রিটিশরাজের নিপীড়ন, অন্যদিকে যুগযুগ ধরে চলে আসা স্থাণু সমাজের যুক্তিহীন আচার-বিচার। বিরসার দমবন্ধ হয়ে আসে। মুক্তির আশায় সে চলে যায় গভীর অরণ্যে। ফলমূল খেয়ে থাকে। একদিন স্বপ্ন দেখে,

মুণ্ডাদের দেবতা সিংবোঙা যেন তাকে ধর্ম প্রবর্তনের দিশা দেখাচ্ছেন। অরণ্যজননী জানিয়ে দিচ্ছেন লড়তে হবে কাদের বিরুদ্ধে!

উদ্দীপ্ত বিরসা এখন 'ধরতি আবা'—পৃথিবীর পিতা। এই অনুভবে ঋদ্ধ বিরসা ফিরে আসেন গ্রামে। মুণ্ডা জনজাতি তাঁকে দেখে একত্রিত হয়। বিরসা বলেন, ''আমি নতুন ধর্ম শেখাব। মরতে আর মারতে শেখাব।'' সূচনা হল নব্যমুণ্ডা ধর্মের, যা 'বিরসাইত ধর্ম' বলে খ্যাত।

বিরসার পূর্বপুরুষেরা হিন্দুধর্মাশ্রিত ছিলেন। খ্রিস্টান প্রচারকরা তাঁর বাবাকে জমি হারানোর ও পুলিশি অত্যাচারের ভয় দেখিয়ে খ্রিস্টানধর্ম গ্রহণ করতে বাধ্য করে। ফলে বিরসার অভিজ্ঞতায় হিন্দু ও খ্রিস্টান ধর্মাদর্শ সঞ্জীবিত ছিলই। তিনি পরে বন্দগাওয়ের জমিদার জগমোহন সিংয়ের মুনশি আনন্দ পাণ্ডে ও তাঁর ভাই রঘুনাথ পাণ্ডের সান্নিধ্যে এসে বৈষ্ণব ভাবাদর্শে উদ্বুদ্ধ হন। তিনি প্রতিদিন রামায়ণ-মহাভারত পাঠ করতেন। 'বিরসাইত ধর্মে'র মূলমন্ত্র ছিল কুসংস্কারহীন ধর্মাচরণ, ঈশ্বরের প্রতি আস্থা, মদ্যপান ও পশুবলি থেকে বিরত হওয়া, ডাইনি-পিশাচ প্রভৃতিতে বিশ্বাস না করা, শিষ্টাচার মেনে জীবন যাপন। তাঁর কথা, ''পিঁপড়ের মতো পরিশ্রমী হও, পশু-পাখির মতো মিলেমিশে থাকতে শেখো, সকলকে ভালবাসো।'' হিন্দু ও খ্রিস্টান রীতিনীতির সঙ্গে মুণ্ডাজাতির বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে বিরসা প্রার্থনাও প্রণয়ন করেন। দলে দলে আদিবাসীরা 'ধরতি আবা'র শরণাপন্ন হতে থাকে।

১৮৯৫ সাল। ব্রিটিশ ও জমিদারদের অত্যাচারে মুণ্ডারা নিপীড়িত, সেইসঙ্গে শুরু হয়েছে খরা। জঙ্গলের ফলমূল আর কন্দ তাদের একমাত্র আহার্য। ঘরে ঘরে মানুষ মরছে না খেতে পেয়ে। লেখাপড়া জেনেও বিরসা তাদের জন্য কিছুই করতে পারছেন না। হতাশায় দগ্ধ হন বিরসা। তখনই তাঁর গ্রামের একটি মেয়ে মারা গেল। মুণ্ডা সমাজের নিয়ম মেনে তাকে সমাধি দেওয়া হল; সেই সঙ্গে তার যা গয়নাগাঁটি সামান্য ছিল তাও, সঙ্গে একটি সিকি। দেখে বিরসা বিহ্বল হয়ে পড়েন। তাঁর মনে হল, জ্যান্ত মানুষটা মরল না খেতে পেয়ে, আর তার রোঁয়ার (আত্মার) জন্য এসব দেওয়া নেহাতই কুসংস্কার! কার দাবি বড়—জীবিতের না মৃতের? রাত্রে কবর খুঁড়ে বিরসা মৃতের গয়নাগাঁটি ও পয়সা তুলে নিলেন। পরদিন হাটে সেসব বিক্রি করে চাল কিনে বিলিয়ে দিলেন অভুক্ত মুণ্ডাদের মধ্যে। কিন্তু কবর খোঁড়ার কথা জানাজানি হওয়াতে লোকে বলতে লাগল—বিরসা পাগল। আর একবার তাঁদের গ্রামে দেখা দেয় বসন্ত রোগের প্রকোপ। বিরসা তখন মুণ্ডাদের ভগবান। এই ভগবান মড়কে ছুটে যান সেবকদল নিয়ে, রোগীকে আলাদা রাখেন, তার দেহে মলম ও চন্দন লেপে দেন; তার জামাকাপড় আলাদা করে ধুয়ে দেন। মড়কের গতিপথ বন্ধ হয়। বিরসার খ্যাতি ছড়ায় গ্রামে গ্রামে।

বিরসা আদিবাসী সমাজকে একত্রিত ও সংস্কার-মুক্ত করতে প্রাণপাত করেছেন। তিনি অনুগামীদের ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহের প্রশিক্ষণ দিতেন।

১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি ঘোষণা করেন 'উলগুলান' (মুণ্ডা বিদ্রোহ)। এই কর্মকাণ্ডের ঘাঁটি ছিল ডোমবারি অঞ্চল। স্থানটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ তার তিনদিকে পর্বতশ্রেণি আর একদিকে অরণ্যঘেরা উপত্যকা। বিরসা তাঁর অনুগামীদের উদ্দীপ্ত করেন অন্যায় বঞ্চনার কথা মনে করিয়ে দিয়ে : ''এই রাজা আর জমিদাররা আমাদের রক্ত চুষে শেষ করছে। জাতটাকে বানিয়েছে বেঠ বেগার [দীনমজুর]। আমাদের ধুতি, পাগড়ি, জামা, জুতো, ছাতা ব্যবহার নিষেধ করে দিয়েছে; উঁচু জায়গায় বসা, মন্দিরে ঢোকা, কাঁসা-পিতলের বাসনে খাওয়াও নিষিদ্ধ করেছে।'' ১৮৯৮ সালের জানুয়ারির শেষ থেকে ১৮৯৯ এর নভেম্বর পর্যন্ত মুণ্ডারা বিরসার নেতৃত্বে জমিদার আর ব্রিটিশরাজের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালাতে থাকে। হিন্দু জমিদারদের অধীনস্থ গ্রাম চুটিয়া, জগন্নাথপুর ও নওরতন গড় তারা আক্রমণ করে। বিরসা একের পর এক সভা করে চললেন। তাঁর স্লোগান ছিল, ''আবুয়া রাজ এতে জানা, মহারানিরাজ তুণ্ডু জানা'' (আমাদের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে, মহারানির রাজত্ব ধ্বংস করতে হবে)। মুণ্ডা বিদ্রোহ চলতে থাকে পুরোদমে। ১৯০০ সালের জানুয়ারিতে এক জার্মান জঙ্গল ঠিকাদার ও তার চাকরকে বিদ্রোহীরা হত্যা করে। বিরসা সভা করেন গয়া মুণ্ডার বাড়িতে। সংবাদ পেয়ে দুই কনস্টেবল তিন চৌকিদার সহ তাঁকে গ্রেপ্তার করতে এলে বিদ্রোহীরা তাদের মেরে ফেলে। এবার ব্রিটিশরাজ নড়ে বসে। বিদ্রোহ দমনে এগিয়ে আসে রাঁচির ডেপুটি কমিশনার স্ট্রিটফিল্ট, বিশাল সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী নিয়ে। তাদের বিরুদ্ধে মুণ্ডা নারীপুরুষ লড়ে তীরধনুক, টাঙ্গি ও তলোয়ার নিয়ে। তারা রাঁচির খুঁটি থানা আক্রমণ করলে পুলিশ থানা ছেড়ে পালায়। পরিস্থিতি মোকাবিলায় আসে ডোরান্ডা ও দুমকা থেকে পুলিশ, সিংভূম ও রাঁচির পুলিশ কমিশনার, ডেপুটি কমিশনার। গ্রামে গ্রামে চলে চিরুনি তল্লাশি। মুণ্ডা পুরুষরা দলে দলে বন্দি হয়। মেয়েরা গ্রামেই নজরবন্দি হয়ে থাকে। বিরসাকে ধরিয়ে দিতে পারলে পাঁচশো টাকা আর অন্য বিদ্রোহীদের ক্ষেত্রে একশো টাকা পুরস্কার সরকার ঘোষণা করে।

১৯০০ সালের ৩ জানুয়ারি। বিরসা ও তাঁর অনুগামীরা ছিলেন চক্রধরপুরের জামকোপাই জঙ্গলে। বিরসা ঘুমোচ্ছেন, অন্যেরা কাঠের আগুনে ভাত রাঁধছে। দূর থেকে ধোঁয়া দেখে সাত আদিবাসী টাকার লোভে সশস্ত্র পুলিশবাহিনী নিয়ে সেখানে হাজির হয়। বন্দি হন বিরসা। তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় রাঁচি জেলে। 'ধরতি আবা'কে দেখতে হাজার হাজার মুণ্ডা সমবেত হয় রাস্তার ধারে। বন্দি বিরসার চোখে-মুখে হাসির ছটা। সকলের উদ্দেশে তিনি বলেন, ''ফিরে আসব আমি, আবার জ্বালাব হোলির আগুন, স্থাপন করব স্বাধীন মুণ্ডারাজ।'' রাঁচি জেলের কুঠুরিতে লোহার শিকলে বাঁধা থাকেন 'ধরতি আবা'। ১৯০০ খ্রিস্টাব্দের ৯ জুন সকাল নটায় রক্তবমি হয়ে বিরসা মারা যান। জানা যায় আর্সেনিক বিষ প্রয়োগই তাঁর মৃত্যুর কারণ, যদিও সরকার প্রচার করে কলেরা রোগে বিরসার মৃত্যু হয়েছে। তখন তাঁর বয়স পঁচিশ।

বিরসা কেবল স্বাধীনতা সংগ্রামীই নন— নিপীড়িত আদিবাসী সমাজের মুক্তির দিশারি তিনি। তাঁর ঈশ্বরনির্ভরতা, ধর্মীয় সহিষ্ণুতা, কুসংস্কারমুক্ত মানসিকতা, সেবা এবং ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী মনোভাব স্বামী বিবেকানন্দকে স্মরণ করায়। তাঁরা সমসাময়িক এবং উভয়ের খবরই সংবাদপত্রে স্থান পেত; তাই খুব সম্ভব তাঁরা পরস্পরের কথা জেনেছিলেন। ✠

সহায়ক গ্রন্থ

১। মহাশ্বেতা দেবী, *বিরসা মুণ্ডা*, প্যাপিরাস, ১৯৯৮
২। *Life and Movements of Birsa Munda*, Edited by Dr. Manoj Sahare, Publisher : Dr. V.D. Chopra, 2021